প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের গঠনতন্ত্রের তুলনামূলক পর্যালোচনা

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক' এবং স্বপন কুমার সাহা, সমন্বয়কারী, সুজন সচিবালয় (২১ মে, ২০০৭)

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব রাজনীতিবিদ তথা রাজনৈতিক দলের, অন্য কারো নয়। রাজনৈতিক দল হলো গণতন্ত্রের চালিকা শক্তি বা ইঞ্জিনস্বরূপ। গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জনকল্যাণে নিবেদিত রাজনৈতিক দল ছাড়া যেমন গণতন্ত্র কার্যকর হয় না, সুশাসনও প্রতিষ্ঠিত হয় না। আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্র কতটুকু গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ এবং বাস্তবে গঠনতন্ত্র কতটুকু অনুসরণ করা হয় তা পর্যালোচনা করাই এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য। আলোচনার জন্য প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রের একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূল চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো। আমরা মনে করি, রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র নিশ্চিত করা না গেলে, নেতৃত্ব থেকে দুর্নীতিবাজদের দূরে রাখা না গেলে, 'মনোনয়ন বাণিজ্য' বন্ধ করা না হলে, দলে পরিবারতন্ত্রের অবসান করা না গেলে, দেশে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না।

১.	**গণতান্ত্রিক বিধিবিধান**	মন্তব্য
	ক) **সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ও পদ্ধতিঃ**	
	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব অখন্ডতা, জননিরাপত্তাবিরোধী, হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত নন এবং দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী এমন যে কোন ১৮ বছর বা ততোধিক বয়সের বাংলাদেশী নাগরিক নির্ধারিত ফরমে আবেদনের সাথে ত্রি-বার্ষিক চাঁদা বাবদ ৫ টাকা প্রদান করে সদস্য হতে পারবেন। প্রাথমিক বা শাখা কমিটির সদস্যদের সাধারণ সভায় অনুমোদিত হওয়ার পর ১ বছর প্রাথমিক সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন। মেয়াদ পূর্ণ হবার পর সংশ্লিষ্ট কমিটির সুপারিশ সাপেক্ষে জেলা কার্য নির্বাহী সংসদ পূর্ণাঙ্গ সদস্য পদ প্রদান করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকলে আবেদনকারীর মেয়াদান্তে আপনা আপনি পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ লাভ করবেন। পূর্ণাঙ্গ সদস্য না হলে কেউ দলের কোন স্তরের কর্মকর্তা নির্বাচিত হতে পারবেন না। তবে সংগঠনের স্বার্থে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষে সভাপতি কর্মকর্তা হিসেবে গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করতে পারবেন।	জননিরাপত্তা বিরোধী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের সদস্যপদ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে অনেক সদস্যের নামেই এধরণের অভিযোগ রয়েছে। দলীয় সদস্যদের রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা করা হয়নি।
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার বিরোধী, গোপন সশস্ত্র রাজনীতিতে বিশ্বাসী বা সক্রিয়, সমাজ ও গণবিরোধী নয় এমন যে কোন ১৮ বছর বা ততোদিক বয়সের বাংলাদেশী নাগরিক **বিএনপির** নির্ধারিত ফরমে আবেদন এবং দলের গঠনতন্ত্র, কর্মসূচির প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে সদস্য হতে পারবেন। আবেদনপত্র গৃহীত হলে সদস্য প্রমাণস্বরূপ পরিচয়পত্র দেয়া হবে। প্রাথমিক সদসস্যের জন্য দুই টাকা চাঁদা এবং সদস্য পদ লাভের পর বাৎসরিক ১ টাকা চাঁদা দিতে হয়। কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে সরবরাহকৃত রসিদের মাধ্যমে সদস্যদের চাঁদা গ্রহণের বিধান আছে। থানা অফিস তাদের স্ব স্ব এলাকার প্রাথমিক সদস্য পদের তালিকা এবং কেন্দ্রীয় অফিসে দলের সর্বমোট সদস্য সংখ্যা, সদস্যের নাম ও ঠিকানা বিধি সম্মতভাবে সংরক্ষণ করবে।	সদস্যপদ অনুমোদনের সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতির উল্লেখ নেই এবং কে অনুমোদন করবেন তাও স্পষ্ট নয়। গোপন সশস্ত্র রাজনীতিতে বিশ্বাসী বা সক্রিয় কোন ব্যক্তি সদস্যপদে যোগ্য নয়। তাহলে দলের যে সকল মন্ত্রী, এম.পি জেএমবি/বাংলা ভাইকে অনেকটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন যুগিয়েছে তাদের সদস্যপদ এখনো কীভাবে বহাল আছে?
	জাতীয় পার্টিঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অখন্ডতা, গণবিরোধী, সশস্ত্র রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয় এমন যে কোন ১৮ বছর বা ততোধিক বয়সের সৎ বাংলাদেশী নাগরিক নির্ধারিত ফরমে আবেদন এবং দলের গঠনতন্ত্র, কর্মসূচির প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে সদস্য হতে পারবেন। আবেদন পত্রের সাথে প্রাথমিক সদস্যের জন্য ৫ টাকা ও বাৎসরিক সদস্যপদ নবায়নের জন্য ১০ টাকা প্রদান করতে হবে। কেন্দ্র থেকে সরবরাহকৃত রসিদ বইয়ের মাধ্যমে চাঁদা সংগ্রহ করার বিধান আছে। প্রত্যেক শাখা অফিস আঞ্চলিক সদস্যদের তালিকা এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয় পার্টির সর্বমোট সদস্য সংখ্যা, সদস্যদের নাম ও ঠিকানা সংরক্ষণ করবে।	গঠনতন্ত্রে সদস্যপদ অনুমোদনের সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতির উল্লেখ না থাকলেও সদস্য ফরমে স্থানীয় নির্বাহী কমিটিও কেন্দ্রীয় ওয়ার্কি কমিটির মতামতের ঘর রয়েছে। অসৎ, গণবিরোধী ও সশস্ত্র রাজনীতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ দলের সদস্যপদের যোগ্য নন। তাহলে পার্টির গঠনতন্ত্র যথাযথভাবে অনুসরণ করলে পার্টির প্রধানেরই সদস্যপদ থাকার কথা নয়।
	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশঃ জামায়াতের মৌলিক আকীদা, শরীয়তের নির্ধারিত ফরয ও ওয়াজিবসমূহ রীতিমত আদায় করেন, হারাম অর্জন করে থাকলে তা ত্যাগ করবেন এবং দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং গঠনতন্ত্রের নিয়ম-শৃঙ্কলা মেনে চলবেন এমন যে কোন সুস্থ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ও পূর্ণ বয়স্ক নর-নারী জামায়াত সদস্য হওয়ার জন্য অভিপ্রায় জানালে আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা কর্তৃক নির্ধারিত পন্থা অনুসারে উক্ত ব্যক্তির সদস্যপদ মঞ্জুর	গঠনতন্ত্রে সদস্যদের চাঁদার পরিমাণ উল্লেখ নেই। দলীয় সদস্যদের তালিকা সংরক্ষণের বিষয়ে গঠনতন্ত্রে কোন উল্লেখ নেই। মজলিসে সুরার নির্ধরিত পন্থা সম্পর্কে গঠনতন্ত্রে কিছু

	করবেন। মঞ্জুরীপ্রাপ্ত ব্যক্তি আমীরে জামায়াত বা তাঁর কোন প্রতিনিধির সামনে শপথ গ্রহণ করবেন এবং শপথ গ্রহণের দিন থেকে তিনি সদস্য বলে গণ্য হবেন।	বলা নেই। আমীরের জামাতেই ই কী পদ্ধতি নির্ধারণ করেন?
	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি: ১৮ বছর বা তার অধিক বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক নির্ধারিত ফরমে আবেদন ও পার্টির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য গঠনতন্ত্র মেনে চলতে সম্মত হলে সদস্য হতে পারবেন। সদস্য পদের জন্য উক্ত ব্যক্তিকে চেনেন ও জানেন এরূপ পার্টির দুইজন সদস্যের সুপারিশ ও সংশ্লিষ্ট শাখার সাধারণ সভায় অনুমোদন লাগবে। ছয় মাস পর্যন্ত প্রার্থী সদস্য বলে গণ্য হবেন। সংশ্লিষ্ট পার্টি সংগঠনে প্রার্থী সদস্য সম্বন্ধে ভিন্ন কোনরূপ সিদ্ধান্ত না থাকলে ছয় মাস পর তিনি আপনা আপনি পূর্ণ সদস্য বলে বিবেচিত হবেন। কেন্দ্রীয় কমিটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রার্থীর সদস্যপদ বাদ দিয়ে সরাসরি পূর্ণ সদস্যপদ প্রদান করতে পারবে। পূর্ণ সদস্যপদ অনুমোদনের পর প্রত্যেক সদস্যকে সাধারণ সভায়/ কমিটির সভায় শপথ নিতে হয়।	গঠনতন্ত্রে পার্টির সদস্য তালিকা সংরক্ষণ বিষয়ে কোন উল্লেখ না থাকলেও তারা সদস্যদের নামের তালিকা সংরক্ষণ করে থাকে। গঠনতন্ত্রে নির্দিষ্ট কোন চাঁদা বা সদস্য ফির উল্লেখ নেই, তবে প্রত্যেক সদস্যকেই তার আয়ের উপর ভিত্তি করে লেভীর হার নির্ধারিত হয়ে থাকে।
	খ) নির্বাচন প্রক্রিয়া	
	আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরাই দলের কর্মকর্তা। **কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী** কমিটির ৭৩ জন সদস্যের মধ্যে ২৬ জন সদস্য ছাড়া (যাদেরকে সভাপতিমন্ডলীর সাথে আলোচনাসাপেক্ষে সভাপতি মনোনয়ন দিয়ে থাকেন) অন্যরা অর্থাৎ সভাপতি, সভাপতিমন্ডলী, সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ, কোষাধ্যক্ষ ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে থাকেন। জাতীয় কমিটির ১৬৬ জনের মধ্যে ২১ জন সদস্য এবং উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন। জেলা, উপজেলাসহ অন্যান্য ইউনিটের কর্মকর্তাগণও ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিলের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। আওয়ামীলীগের কর্মকর্তাগণের কার্যকাল তিন বৎসর। তবে তারা পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকতে পারবেন।	গোপন ব্যালটে নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা নেই এবং প্রায় সময়ে নির্দিষ্ট সময়ে কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয় না। ফলে একই কর্মকর্তাগণ বছরের পর বছর নিদিষ্ট আসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হলেও কাউন্সিলারগণ কমিটি নির্বাচনের ব্যাপারে সকল দায়িত্ব সভানেত্রী/সভাপতির উপর অর্পণ করে। ফলে কমিটির কর্মকর্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলীয় প্রধানের পছন্দ ও অপছন্দই প্রাধান্য পায়।
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এর চেয়ারম্যান জাতীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দের সরাসরি ভোটে দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ (১৫ জন, যারা পার্লামেন্টারী বোর্ডের এবং জাতীয় নির্বাহী কমিটিরও সদস্য), উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ (১৫ জন, যারা জাতীয় নির্বাহী কমিটিরও সদস্য) এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের ২৫১ জন সদস্যের মধ্যে পদাধিকার বলে জেলা ও নগর কমিটির সভাপতি ছাড়া বাকী সবাই সরাসরি চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন। গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা শহর/পৌরসভা, নগর ওয়ার্ড কমিটির কর্মকর্তাগণ কাউন্সিল অধিবেশনের মাধ্যমে দুই বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন।	কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে দলের চেয়ারপারসনের একক আধিপত্য বিরাজমান। গত ১৪ বছর ধরে বিএনপি'র কোন কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয় নি। সমাজের দুর্নীতি পরায়ন বা কুখ্যাত বলে পরিচিত ব্যক্তি দলের কোন কমিটিতে সদস্য হিসাবে থাকতে পারবেন না, দলের গঠনতন্ত্রে এইরূপ বিধান থাকলেও দলের বিভিন্ন কমিটির সদস্যের নামেই দুর্নীতি, চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে এবং তারা কিভাবে এখনও দলের কমিটিতে বহাল আছেন?
	জাতীয় পার্টিতে প্রতি দুই বছর পর পর চেয়ারম্যান, প্রেসিডিয়াম, কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যসহ উপজেলা, জেলা, মহানগর শাখার কমিটির কর্মকর্তা কাউন্সিলের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। পার্টির পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য এবং উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য পার্টির চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন।	কর্মকর্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে গোপন ভোটের কোন বিধান নেই। কাউন্সিলার কর্তৃক গঠিত সাবজেক্ট কমিটি কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির একটি প্যানেল তৈরি করে চেয়ারম্যানের নিকট পেশ করেন। বস্তুত চেয়ারম্যানই কমিটি গঠন করে থাকেন।
	জামায়াতের রুকনদের (সদস্য) সরাসরি গোপন ভোটে আমীরে জামায়াত তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন। জামায়েত আমীরকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা থাকবে এবং এর কার্যকাল হবে তিন বছর। আমীরে জামায়াত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ গঠন, নায়েবে আমীর, সেক্রেটারী জেনারেল, সহকারি সেক্রেটারীসহ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের অন্যান্য সদস্যকে নিয়োগ ও অপসারণ করবেন। এছাড়াও জেলা ও উপজেলার রুকনদের মতামত যাচাই করে আমীরে জামায়াত, জেলা/উপজেলা আমীরের নিয়োগ ও	এখানেও আমীরে জামায়াত এর একচ্ছত্র আধিপত্য বিরাজমান। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা ও অন্যান্য কমিটির সদস্য সংখ্যা কত হবে তা স্পষ্টভাবে গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নেই।

	অপসারণ করে থাকনে।	
	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত প্রতিটি কমিটি ও কর্মকর্তা গোপন ব্যালটে নির্বাচিত হবেন। কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মূকর্তাগণ চার বছর পর পর পার্টি কংগ্রেসের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। কেন্দ্রীয় কমিটি তার সদস্যদের মধ্য থেকে একটি প্রেসিডিয়াম নির্বাচন করবে। প্রেসিডিয়ামের সদস্য সংখ্যা কেন্দ্রীয় কমিটির এক-চতুর্থাংশের বেশি হবে না। জেলা, উপজেলা কমিটির সদস্যগণ জেলা/ উপজেলা সম্মেলনের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন।	কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কত হবে তা স্পষ্টভাবে গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নেই।
	গ) বিভিন্ন কমিটি, কার্যক্রম ও ক্ষমতা	
	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রধান সাংগঠনিক স্তর বা কমিটিসমূহ হলোঃ ক) **কাউন্সিল**, খ) **জাতীয় কমিটি**, গ) **কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ**, ঘ) **সভাপতি মণ্ডলী**। জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ দ্বারা নির্বাচিত নির্দিষ্ট সংখ্যক (প্রতি ২৫ হাজার জনসংখ্যার জন্য একজন) এবং দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ ও সহযোগী সংগঠনের সভাপতি (পদাধিকারবলে) ও সম্পাদকসহ নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যের সমন্বয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল গঠিত হয়। দলের গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র, কর্মসূচী/নীতি প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন, কর্মকর্তা নির্বাচন, সংসদীয় বোর্ড গঠন ইত্যাদি আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের প্রধান কার্যাবলী ও ক্ষমতার অর্ন্তভূক্ত। জাতীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা ১৬৬ জন, যার মধ্যে ২১ জন সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন। কার্যনির্বাহী সংসদ ও কাউন্সিলের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কাউন্সিলারকে সহায়তা প্রদান, দলের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ ও অনুমোদন, সংসদীয় পার্টির পরিচালনার নিয়মাবলী প্রণয়ন, কার্যনির্বাহী সংসদ কর্তৃক গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপিল বিবেচনা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি জাতীয় কমিটির মূল কার্যাবলী। কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য সংখ্যা ৭৩, যার ২৬ জন সভাপতি মণ্ডলরী সাথে আলোচনাক্রমে সভাপতি মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। আওয়ামী লীগের শাখা কমিটিসমূহকে অনুমোদন, বাতিলকরণ, পুনঃনির্বাচনের ব্যবস্থা, এডহক কমিটি গঠন, উল্লেখিত কমিটির কর্মকর্তার পদ শূণ্য হলে উক্ত পদ ৬০ দিনের মধ্যে পূরণ করা, সংসদীয় দলের কোন সদস্য গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কোন কাজ করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় অনুমোদন, জাতীয় কমিটিতে পেশ করবার জন্য আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত, কার্যনির্বাহী সংসদের কোন সদস্য যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ খারিজ, কোন শাখা কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপিল বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি কার্যনির্বাহী সংসদের প্রধান কার্যক্রম ও ক্ষমতা। প্রেসিডিয়ামের সদস্য সংখ্যা ১৫ জন। কার্যনির্বাহী সংসদের ২৬ জন সদস্যকে মনোনয়নের জন্য সভাপতিকে পরামর্শ প্রদান, সম্পাদকমণ্ডলীর সহিত আলোচনাক্রমে রাষ্ট্রের কল্যান, ঐক্য ও নিরাপত্তার স্বার্থে বিশেষ জরুরি অবস্থায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কার্যনির্বাহী সংসদ ও কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ ও নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দলের আদর্শ, নীতি, উদ্দেশ্য, কর্মসূচী ও সংগঠন বিষয়ে সকল প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি প্রেসিডিয়ামের কার্যক্রমের অর্ন্তভূক্ত। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৪১ জন, তবে সভাপতি সদস্য সংখ্যা বাড়াতে পারেন। মূলত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে গবেষণা, মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ প্রদানের মধ্যেই উপদেষ্টা পরিষদের কার্যক্রম সীমিত। পার্লামেন্টারী বোর্ডের সংখ্যা ১১ জন, যারা কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে থাকেন।	বিভিন্ন সাংগঠনিক কমিটির দায়িত্ব নির্ধারিত থাকলেও বাস্তবে দলীয় প্রধানই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করে থকেন। উদাহরণস্বরূপ গত ২২ জানুয়ারির বাতিল নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রেসিডিয়াম বা দলের অন্য কোন ফোরামে কোনরূপ আলোচনা না করেই গোপনে সভাপতির নির্দেশে সাধারণ সম্পাদক খেলাফত মজলিশ-এর সাথে পাঁচ দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যা দলের অসাম্প্রদায়িক নীতিরও পরিপন্থী। এখানে উল্লেখ থাকে যে, আওয়ামী লীগের ওয়েব সাইটের হোম পেজে তিন জনের ছবি আছে – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ হাসিনা এবং সজীব ওয়াজেদ জয়। এখানে সজীব ওয়াজেদ জয়-এর ছবি রাখার কারণ কী? উনি তো দলের কোন কেন্দ্রীয় নেতাও নন!
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রধান প্রধান সাংগঠনিক স্তর বা কমিটিসমূহ হলোঃ ক) **জাতীয় কাউন্সিল**, খ) **জাতীয় নির্বাহী কমিটি**, গ) **জাতীয় স্থায়ী কমিটি**, ঘ) **পার্লামেন্টারী বোর্ড**, ঙ) **পার্লামেন্টারী পার্টি**। প্রতি থানা, শহর/পৌরসভা, জেলা, নগর কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, জেলা ও নগর কমিটি কর্তৃক মনোনীত প্রতি জেলা থেকে দু'জন মহিলা সদস্য, পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্যবৃন্দ, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দসহ মোট সদস্য সংখ্যার ১০ ভাগ চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়ে বিএনপি'র জাতীয় কাউন্সিল গঠিত হয়। জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা ২৫১ তবে চেয়ারম্যান এ সংখ্যা ১০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারেন, যার জন্য যথাশীঘ্র জাতীয় স্থাযী কমিটির অনুমোদন নিতে হবে। দলের বিভিন্ন কমিটির কর্তব্য ও দায়িত্বের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়, সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, দলের কর্মসূচি বাস্তবায়ন, অঙ্গ সংগঠনের কার্যকলাপ তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়, স্থায়ী কমিটির নির্দেশে অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ইত্যাদি জাতীয় নির্বাহী কমিটির মূল দায়িত্ব। স্থায়ী কমিটির সদস্য সংখ্যা ১৫ জন, যারা পার্লামেন্টারী বোর্ডেরও সদস্য। দলের নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন, শাস্তিব্যবস্থার পুর্নবিবেচনা (চেয়ারম্যানের অপসারণ ছাড়া), দলের প্রচারপত্র ও প্রকাশনার অনুমোদন, যে কোন কমিটির কাজ মূলতবী রাখা কিংবা বাতিল করে পুন:নির্বাচনের নির্দেশ প্রদান ইত্যাদি স্থায়ী কমিটির প্রধান কার্যক্রম। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৫ জন, তবে চেয়ারম্যান এ সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারেন।	দলের নীতি নির্ধারণী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা জাতীয় স্থায়ী কমিটির থাকলেও কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় না। ফলে চেয়ারম্যানের ইচ্ছাতেই দলের সকল নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে। যেমন সম্প্রতি মেজর অব. সাঈদ ইস্কেন্দারকে দলের কোন কোরামে আলোচনা না করেই সহ-সভাপতি পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও বিএনপি'র গঠনতন্ত্রে সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিবের কোন পদ না থাকলেও জনাব তারেক রহমান'কে বিভাবে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব পদে নিয়োগ দেয়া হলো তা বোধগম্য নয়।

	জাতীয় পার্টি: জাতীয় পার্টির প্রধান সাংগঠনিক স্তর বা কমিটিসমূহ হলোঃ ক) **জাতীয় কাউন্সিল**, খ) **কেন্দ্রীয় ওয়াকিং কমিটি**, গ) **প্রেসিডিয়াম**, ঘ) **পার্লামেন্টারী বোর্ড**, ঙ) **পার্লামেন্টারী পার্টি**। জাতীয় কাউন্সিল পার্টির সর্বোচ্চ পরিষদ। দুই বছর পর পর ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি, উপজেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং জেলা কমিটির ১৫ জন সদস্য নিয়ে কাউন্সিল গঠিত হয়। পার্টির চেয়ারম্যান ও প্রেসিডিয়াম, কেন্দ্রীয় ওয়াকিং কমিটির নির্বাচন করা, বিষয়ক কমিটি গঠন, দলের গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র, কর্মসূচি অনুমোদন, বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা ও অনুমোদন, ভবিষ্যৎ কর্মকান্ডের পরিকল্পনা নির্ধারণ ইত্যাদি জাতীয় কাউন্সিলের প্রধান প্রধান কার্যাবলীর অর্ন্তভূক্ত। কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সংখ্যা ২৯৯ জন। পার্টির নির্বাহী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নসহ প্রেসিডিয়ামের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিভিন্ন কমিটির কর্তব্য, দায়িত্বের নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয় সাধন, তদারক, বিভিন্ন কমিটির সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, সহযোগী ও অঙ্গ সংগঠনের কার্যাবলী তদারক, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ এবং চেয়ারম্যানের নির্দেশে অন্যান্য কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন ইত্যাদি কেন্দ্রীয় ওয়াকিং কমিটির মূল কার্যাবলী। প্রেসিডিয়ামের সদস্য সংখ্যা ৪১জন, যারা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। পার্টির প্রধান নীতি নির্ধারণী সংস্থা হিসাবে পার্টির নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং সকল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রেসিডিয়ামের কাজ।	বাস্তবে দলীয় প্রধানই সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। যেমন, গত জানুয়ারির নির্বাচনে জাতীয় পার্টি কোন জোটে যোগ দিবে এ বিষয়কে কেন্দ্র করে পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য জি এম কাদেরকে সভাপতি বরখাস্ত করেন।
	জামায়াতঃ জামায়াতের প্রধান সাংগঠনিক স্তর বা কমিটিসমূহ হলোঃ ক) **কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলন**, খ) **কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা**, গ) **কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ**, ঘ) **কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ**। জামায়াতের সকল বিষয়ে রুকন সম্মেলনই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। জামায়াতের গঠনতন্ত্রের বাখ্যাদান ও সংশোধন, বাইতুল মালের হিসাব পরীক্ষার জন্য অডিটর নিয়োগ ও পেশকৃত রিপোর্ট বিবেচনা, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন গঠন, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও বাজেট অনুমোদন, পার্লামেন্টালী বোর্ড গঠন ও এর কর্তব্য নির্ধারণ, আমীরে জামায়াতের অপসারণ, জামায়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার প্রধান কার্যাবলীর অর্ন্তভূক্ত। আমীরে জামায়াতকে সর্বাত্মক সহযোগিতা, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বৈঠক না হলে বা আহ্বান করা সম্ভব না হলে কেন্দ্রীয় মজলিসের সকল ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগ করা কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের প্রধান কার্যাবলী। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করাই হলো কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের প্রধান কাজ।	রুকন সম্মেলন কত দিন পর পর অনুষ্ঠিত হবে তা গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নেই। মজলিসে শূরা যখন প্রয়োজন মনে করবেন তখনই সম্মেলন অনুষ্ঠত হবে।
	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিঃ কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান স্তরগুলো হলোঃ ক) **পার্টি কংগ্রেস**, খ) **কেন্দ্রীয় কমিটি**, গ) **জাতীয় পরিষদ**। পার্টি কংগ্রেস সংগঠনের সর্বোচ্চ সংস্থা। পার্টির মূল নীতি কর্মকৌশল নির্ধারণ করা, কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক উস্থাপিত রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্ট পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, গঠনতন্ত্র সংশোধন, অডিট কমিটি নির্বাচন ও কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান পার্টির কংগ্রেসের কার্যাবলীর অর্ন্তভূক্ত। দুই কংগ্রেসের মধ্যবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটি হলো পার্টির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী সংস্থা। দলের রাজনৈতিক নের্তৃত্বদান, পার্টির নীতি ও গঠনতন্ত্র রক্ষা করা, দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে বিভিন্ন কমিটি গঠন, পার্টির প্রকাশনার দায়িত্ব পালন, পার্টির তহবিলের হিসাব-নিকাশ রক্ষা করা, প্রেসিডিয়াম নির্বাচন ইত্যাদি কেন্দ্রীয় কমিটির মূল কাজ। জাতীয় পরিষদ, পার্টি কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক লাইনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় কমিটিকে পরামর্শ প্রদান করবে। প্রেসিডিয়ামের সদস্য সংখ্যা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সংখ্যার এক-চতুর্থাংশের বেশী হবে না।	কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দিষ্ট সদস্য সংখ্যার কোন উল্লেখ নেই।
	ঘ) কমিটির সভা	
	আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী কাউন্সিল অধিবেশন ছাড়াও বছরে একবার বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন, প্রতি ছয় মাসে জাতীয় কমিটির সভা, প্রতি মাসে অন্তত একবার সম্পাদক মণ্ডলীর সভা অনুষ্ঠানের বিধান আছে। তবে সভাপতি মণ্ডলী ও কার্যনির্বাহী সংসদের সভার বিষয়ে গঠনতন্ত্রে কোন কিছু উল্লেখ নেই।	দলের কাউন্সিলসহ অন্যান্য সভা নির্ধারিত সময় অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয় না।
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গঠনতন্ত্রে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভা, প্রতি মাসে অন্তত একবার জাতীয় স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে।	বাস্তবে নির্ধারিত সময়ে কোন সভাই অনুষ্ঠিত হয় না।
	জাতীয় পার্টির প্রতি দু বছর পর দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনসহ কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সভা তিন মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠিত হবে।	প্রেসিডিয়াম ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভা বছরে কয়টি হবে তার কোন উল্লেখ নেই।
	জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সভা যে কোন সময়ে আমীরে জামায়াত আহ্বান করতে পারেন। তবে বছরে অন্তত দুইবার মজলিসে শূরার সভা অনুষ্ঠিত হবে।	কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ বছরে কয়বার মিলিত হবে এ ব্যাপারে কোন উল্লেখ নাই।

	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস চার বছর পর পর অনুষ্ঠিত হবে। তবে প্রয়োজনে মর্ধবর্তী সময়ে বিশেষ কংগ্রেস আহ্বান করতে পারবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সভা বছরে কমপক্ষে তিনবার এবং বছরে একবার জাতীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।	
২.	**আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা**	
	ক) আয়ের উৎসসমূহ:	
	আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় আয়ের উৎসমূহ হলো কাউন্সিলারদের ত্রি-বার্ষিক চাঁদা (২০ টাকা), কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্যদের নির্দিষ্ট হারে মাসিক চাঁদা, সংসদ সদস্যদের মাসিক ২০০ টাকা হারে চাঁদা, জেলার মঞ্জুরি ফি (১০০ টাকা), বই পুস্তক বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ, এককালীন দান, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ, প্রাথমিক সদস্যভূক্ত হবার চাঁদা পাঁচ টাকা ও তাঁর নবায়ন ফি ইত্যাদি। এছাড়াও দলের অন্যান্য ইউনিট/কমিটিতে মোটামুটি একই পদ্ধতিতে তহবিল সংগ্রহের উল্লেখ আছে।	প্রথম আলোয় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী (৯ ফেব্রুয়ারি,২০০৭), দলের বাৎসরিক খরচের পরিমাণ ১২ কোটি টাকার মতো। দলের গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত আয়ের উৎস থেকে আওয়ামী লীগের এ বিপুল পরিমাণ নির্বাহ করা হয়, তা অবিশ্বাস্য। দৃশ্যমান আয় থেকে দলের খরচের ১০ শতাংশও মেটে না। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত উৎসের বাইরে অর্থাৎ অজ্ঞাত উৎস থেকে অর্থ সংগৃহীত হয়ে থাকে।
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এর আয়ের উৎস বলতে প্রাথমিক সদস্য হতে প্রাপ্ত দুই টাকা এবং নবায়নের জন্য ১ টাকা ছাড়া অন্য কোন আয়ের উৎস গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নেই।	উক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, বিএনপির বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ ১৫ কোটি টাকা মতো। যা গঠনতন্ত্রে উল্লেখিতআয়ের উৎস থেকে মেটানো কোনভাবেই সম্ভব না। এখানেও অজ্ঞাত আয়ের উৎস রয়েছে।
	জাতীয় পার্টির আয়ের উৎস হলো প্রাথমিক সদস্যপদের জন্য ৫ টাকা হারে চাঁদা এবং নবায়ন বাবদ ১০ টাকা, সকল স্তরে মঞ্জুরি চাঁদা বাবদ ধার্যকৃত অর্থ, সমর্থকদের এককালীন দান, জনসাধারণের কাছ থেকে দান হিসাবে সংগৃহীত অর্থ, প্রকাশনা বাবদ আয়, স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি থেকে আয়।	
	জামায়াতের আয়ের উৎসসমূহ হলো সদস্য ও শুভাকাঙ্খিদের নিকট হতে মাসিক ইয়ানত, উশর ও যাকাত, এককালীন দান, অধস্থন সংগঠন হতে প্রাপ্ত মাসিক নিসাব, প্রকাশনা ও সম্পত্তি হতে আয়।	
	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির আয়ের উৎস হলো সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা, লেভী ও প্রকাশনা হতে আয়।	
	খ) অডিট হিসাব:	
	আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য ইউনিট/কমিটি যে সকল চাঁদা বা দান গ্রহণ করবে তার যথাযথ হিসাব রাখার উল্লেখ আছে। আদায়কৃত সকল অর্থ নিজ নিজ ইউনিটের নামে ব্যাংক হিসাবে জমা রাখা এবং নিজ নিজ ইউনিটে সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনার কথা বলা আছে। সাধারণ সম্পাদকগণ নিজ নিজ শাখার অডিটকৃত আয় ব্যয়ের হিসাব ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে পেশ করবেন।	দলের সকল কমিটি ও শাখার ব্যাংক হিসাব থাকার কথা থাকলেও বাস্তবে তা নেই। সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা ব্যয় কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় অনুমোদনের বিধান থাকলেও এ বিধান কখনোই মানা হয় না। এছাড়াও এ পেশাগত সংস্থা দিয়ে এ পর্যন্ত দলের আয় ব্যয়ের কোন অডিট হয় নি (প্রথম আলোর রিপোর্ট)। জাতীয় পার্টিকে জোটবদ্ধ করার জন্য আসন প্রতি ৫০ লাখ টাকা করে দিতে সম্মত হয়। এছাড়াও জনাব এরশাদের জন্য এককভাবে আরো ২৫-৩০ কোটি টাকা দেওয়ার জন্য সমঝোতা হয় (দৈনিক প্রথেম আলো ১৫ জানুয়ারি, ২০০৭)। নিয়মিত আয়-ব্যয়ের অডিট করে রিপোর্ট জনগণের অবগতির জন্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা আবশ্যক।
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কোষাধ্যক্ষ তহবিল সংগ্রহ ও হিসাব রক্ষনাবেক্ষণ করবেন। বানিজ্যিক ব্যাংকে সংগঠনের নামে ব্যাংক হিসাব থাকবে। কোষাধ্যক্ষসহ সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদককে যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে। দলের অর্থ বছর সমাপ্ত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে অডিট রিপোর্ট	গঠনতন্ত্রে প্রতি বছর দলের হিসাব নিরীক্ষা এবং অধর্থবছর শেষ হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে প্রতিবেদন পেশ করার বিধান

	প্রকাশ করার বিধান রয়েছে।	থাকলেও বছরের পর বছর এসবের কোনটাই হয় না। দলের কোষাধ্যক্ষ, তহবিল সংগ্রহ ও হিসাব সংরক্ষণ করবেন। ব্যাংক হিসাব পরিচালনায় কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর আবশ্যক। আশি বছরের বেশি বয়সী অসুস্থ কোষাধ্যক্ষ দলের তহবিল সংক্রান্ত বিন্দু বিসর্গ খবরও রাখেন না (প্রথম আলোর প্রতিবেদন)। দলের অডিট রিপোর্ট জনগণের অবগতির জন্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা আবশ্যক। বিএনপিও জাতীয় পার্টিকে জোটভূক্ত করার জন্য আসন প্রতি ৫০ লাখ টাকা এবং জনাব এরশাদকে এককভাবে অতিরিক্ত ২৫ কোটি টাকা দিতে সম্মত হয়েছিলো (দৈনিক প্রথম আলো ১৫ জানুয়ারি, ২০০৭)। এই বিপুল পরিমান অর্থের উৎস জানার অধিকার জনগণের রয়েছে।
	জাতীয় পার্টির সদস্যদের চাঁদা রসিদ মারফত গৃহীত হবে এবং সকল রসিদ কেন্দ্র থেকে সরবরাহ করা হবে। রসিদ বই এ অবশ্যই ক্রমিক সংখ্যা ও মুড়ি যুক্ত হবে। কোষাধ্যক্ষ সংগঠনের তহবিল সংরক্ষণ ও হিসাব রক্ষণ করবেন এবং পার্টির চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকে জমা রাখবেন। চেয়ারম্যান ও মহা-সচিবের নির্দেশ মোতাবেক সংগঠনের তহবিল থেকে রসিদের বিনিময়ে অর্থ প্রদান করবেন। প্রতি বছর পার্টির আয়-ব্যায়ের হিসাব করা হবে।	তহবিল/আয়-ব্যয়ের অডিটের ব্যাপারে কোন কিছুর উল্লেখ নেই। দলের অডিট রিপোর্ট জনগণের অবগতির জন্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা আবশ্যক।
	জামায়াতের আমীরের অধীনে প্রত্যেক সাংগঠনিক স্তরে কোষাগার (বায়তূলমাল) থাকবে এবং জামায়াতে আমীর উক্ত কোষাগার থেকে সংগঠনের কাজে অর্থ ব্যয় করতে পারবেন। তবে প্রত্যেক আমীর উর্ধ্বতন আমীর এবং সংশ্লিষ্ট মজলিশের শুরা কিংবা সদস্যগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। খ) আমীরে জামায়াত বাইতুল মালের আয়-ব্যয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নিকট দায়ী থাকবে। কেন্দ্রীয় ও জেলা জামায়াতের বাইতুলমালের হিসাব প্রতি বৎসর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা কর্তৃক নিযুক্ত অডিটর দ্বারা পরীক্ষা করতে হবে এবং অডিট রিপোর্ট কেন্দ্রীয় শূরায় পেশ করতে হবে। উপজেলা/থানা ও অন্যান্য অধ:স্থন বাইতুলমালসমূহ অডিটের জন্য জেলা আমীরগণ সংশ্লিষ্ট মজলিসে শূরা কিংবা জেলা রুকন সম্মেলনের সাথে পরামর্শ করে অডিটর নিয়োগ করবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট করে রিপোর্ট জিলা মজলিসে শূরা কিংবা রুকন সম্মেলনে পেশ করবেন।	দলের অডিট রিপোর্ট জনগণের অবগতির জন্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা আবশ্যক।
	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির কেন্দ্রীয় তহবিলের হিসাব নিকাশ রক্ষা করবে। তিন মাস অন্তর অন্তর প্রেসিডিয়াম তহবিল সংক্রান্ত রিপোর্ট পরীক্ষা করবে এবং বছরে একবার কেন্দ্রীয় কমিটিতে এ সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করবে। সদস্যদের প্রাপ্ত চাঁদা ও লেভীর ২০ভাগ কেন্দ্রীয় কমিটি পাবে। অবশিষ্ট ৮০ ভাগ পাবে বিভিন্ন কমিটি।	ব্যাংক একাউন্ট বা এক্সটার্নাল অডিট সম্পর্কে উল্লেখ নেই।
৩.	**প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া**	
	আওয়ামীলীগের ১১ সদস্যবিশিষ্ট পার্লামেন্টারী বোর্ড সকল নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক সদস্যদের মতামত নেয়ার পদ্ধতিগত কোন ব্যবস্থা নাই। তবে জেলা, উপজেলা, থানা আওয়ামী লীগ কার্য নির্বাহী সংসদ মনোনয়ন লাভে ইচ্ছুক প্রার্থীদের গুনাগুন ও জনপ্রিয়তা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করে সংসদীয় বোর্ডের নিকট সুপারিশ বা মতামত প্রেরণের বিধান আছে। তবে পার্লামেন্টারী বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।	আওয়ামী লীগে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে জেলা, উপজেলা কমটির সুনির্দিষ্ট সুপারিশ ব্যবস্থা থাকলেও কার্যত এর কোন প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় না। গত বাতিল নির্বাচনে মনোনয়ন বাণিজ্যের কথা গোপনীয় বিষয় নয়। গত জানুয়ারির বাতিল নির্বাচনে প্রতি আসন সর্বনিম্ন ৫০ লাখ থেকে সর্বোচ্চ ৩০ কোটি টাকায় মনোনয়ন কেনা-বেচা হয়েছে (দৈনিক প্রথম আলো জানুয়ারি ১৪, ২০০৭)। তাই দলের মনোনয়নের জন্য

		প্রাথমিক সদস্যদের পদ্ধতিগত মতামত নেয়ার বিধান গঠনতন্ত্রে থাকা আবশ্যক। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন মনোনয়ন বাণিজ্য রোধ করা সম্ভব হবে অন্যদিকে তেমনি সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিদের নির্বাচিত হবার পথ সুগম হবে।
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পার্লামেন্টারী বোর্ড নির্বাচনে দলে প্রার্থী মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে আহুত সভায় সংশ্লিষ্ট জেলার সভাপতি, তিনজন সহ-সভাপতি ও সম্পাদককে পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য বলে গণ্য করা হয়। তবে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে দলের প্রাথমিক সদস্যদের পদ্ধতিগতভাবে মতামত প্রদানের কোন সুযোগ নেই। প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টারী বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।	গত বাতিল নির্বাচনে মনোনয়ন বাণিজ্যের কথা গোপনীয় বিষয় নয়। তাই দলের মনোনয়নের জন্য প্রাথমিক সদস্যদের পদ্ধতিগত মতামত নেয়ার বিধান গঠনতন্ত্রে থাকা আবশ্যক। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন মনোনয়ন বাণিজ্য রোধ করা সম্ভব হবে অন্যদিকে তেমনি সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিদের নির্বাচিত হবার পথ সুগম হবে।
	জাতীয় পার্টির নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক সদস্যদের মতামত নেয়ার পদ্ধতিগত কোন ব্যবস্থা নেই। প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টারী বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, তবে বোর্ড ঐক্যমতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হলে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।	
	জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে কেবলমাত্র পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠনের উল্লেখ আছে।	কীভাবে মনোনয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে তা গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নেই। বাস্তবে জামায়েত ইসলামও প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে দলের প্রাথমিক সদস্যদের পদ্ধতিগত কোন মতামত গ্রহণ করে না।
	প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে দলের প্রাথমিক সদস্যদের পদ্ধতিগতভাবে মতামত প্রদানের কোন সুযোগ নেই। প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে।	কেন্দ্রীয় কমিটি কী পদ্ধতিতে মনোনয়ন প্রদান করবেন তার কোন সুস্পষ্ট পদ্ধতির কথা গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নেই।
৪.	**দলীয় প্রধানের বিশেষ ক্ষমতা**	
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারম্যান দলের সর্বময় কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ, তদারক ও সমন্বয় সাধন করবেন। তদুদ্দেশ্যে জাতীয় কাউন্সিল, জাতীয় স্থায়ী কমিটি, জাতীয় নির্বাহী কমিটি ও চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য কমিটির ওপর কর্তৃত্ব করবেন এবং প্রয়োজনবোধে চেয়ারম্যান কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং জাতীয় নির্বাহী কমিটি, জাতীয় স্থায়ী কমিটি, বিষয় কমিটিসমূহ এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কমিটিসমূহ বাতিল করতে পারবেন।	বিএনপিতে চেয়ারম্যানের একচ্ছত্র ক্ষমতার কারণে পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা নেই বললেই চলে। দেশে যখন দলের সংস্কার নিয়ে আলোচনা চলছে তখন দলের চেয়ারম্যান একক সিদ্ধান্তে তাঁর ভাইকে সহ-সভাপতি হিসোবে নিযুক্ত করেন। যা দলের অনেক সিনিয়র সদস্যই সমালোচনা করেছেন। তারা এ ধরণের সমালোচনা করেছেন পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণে, পূর্বে হলে তারা এটুকুও করতেন না।
	জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান প্রয়োজনবোধে প্রতিটি স্তরের কমিটি গঠন, পূনর্গঠন, বাতিল, বিলোপ করিতে পারবেন। চেয়ারম্যান পার্টির যেকোন পদে যেকোন ব্যক্তিকে নিয়োগ অপসারণ ও স্থলাভিশিক্ত করতে পারবেন। তিনি এই ধারার ক্ষমতাবলে পার্টির পার্লামেন্টারী বোর্ড-এর দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন করতে পারবেন।	জাতীয় পার্টির প্রেসিডেন্টও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। যা গণতান্ত্রিক ধারার পরিপন্থী। এ বিধান অবিলম্বে গঠ**নতন্ত্র থেকে বাতিল করা আবশ্যক।**
	আওয়ামী সভানেত্রীর বিশেষ কোন ক্ষমতা গঠনতন্ত্রে নেই।	দলীয় গঠনতন্ত্রে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর এরূপ বিশেষ ক্ষমতা না থাকলে বাস্তবে তার ইচ্ছা অনিচ্ছার মাধ্যমেই দলের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।
৫.	**অঙ্গ সংগঠন**	

	আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদ সহযোগী সংগঠনের নীতি নির্ধারণ করবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সম্পাদক সহযোগী সংগঠনের কার্যক্রম তদারক, সমন্বয় করবে। সহযোগী সংগঠন তাদের কার্যাবলীর জন্য আওয়ামী লীগ কার্য নির্বাহী সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন। সহযোগী সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্ট স্তরের কাউন্সিলর হিসাবে গণ্য হবেন।	এর মাধ্যমে লেজুড়বৃত্তি অঙ্গসংগঠন গড়ে ওঠে।
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একাধিক সংগঠন থাকতে পারে। চেয়ারম্যানের অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত কোন সংগঠন দলের অঙ্গ সংগঠন হিসাবে বিবেচিত হবে না। দলের জাতীয় কমিটিতে প্রত্যেক অঙ্গ সংগঠন সর্ম্পকিত একজন সম্পাদক থাকবে। দলের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযেগিতা করা অঙ্গ সংগঠনের মূখ্য উদ্দেশ্য। অঙ্গ সংগঠনের ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র চেয়ারম্যান কর্তৃক পূর্ব অনুমোদিত হতে হবে এবং পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও চেয়ারম্যানের অনুমোদন লাগবে। দল অঙ্গ সংগঠনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্রিয় সহযোগিতা করবে।	
	জাতীয় পার্টির আর্দশ, উদ্দেশ্য প্রচার, আদর্শের ভিত্তিতে সমাজের বিভিন্ন অঙ্গের বিভিন্ন পেশার জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে সহযোগী সংগঠন থাকবে। সহযোগী সংগঠন নিজস্ব নিয়ম নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ার বিধান থাকলেও সকল ক্ষেত্রেই দলের অনুমোদন লাগবে।	
	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও জামায়াতের গঠনতন্ত্রে অঙ্গ সংগঠন সর্ম্পকে কোন উল্লেখ নেই।	দলীয় গঠনতন্ত্রে ছাত্র সংগঠনের বিষয়ে কোনরূপ উল্লেখ না থাকলেও এ দুটি দলে শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন রয়েছে।

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে কয়েকটি বিষয় আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। একটি দল কতটুকু গণতান্ত্রিক তার প্রথম প্রতিফলন ঘটে দলের সদস্যপদ প্রদানের ক্ষেত্রে। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, আওয়ামী লীগ সদস্যপদ প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গণতান্ত্রিক। কমিউনিষ্ট পার্টিরও সদস্য প্রদানের ক্ষেত্রে দলীয় ফোরামে সিদ্ধান্ত নেয়ার বিধান আছে। তবে বিএনপি ও জামায়াতের ইসলামীর গঠনতন্ত্রে সদস্যপদ প্রদানের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির উল্লেখ নেই। এছাড়াও রাজনৈতিক দল কোন আদর্শ বা কর্মসূচীর ভিত্তিতে সংগঠিত, ব্যক্তির সমষ্টি। তাই প্রতিটি দলের জন্য একদল প্রাথমিক সদস্যে থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র এমন প্রাথমিক সদস্যের তালিকা আছে কি না সন্দেহজনক।

গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কয়েক স্তরের সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে এবং এগুলোর সুস্পষ্ট দায়-দায়িত্বও রয়েছে। আওয়ামী লীগ ও কমিউনিষ্ট পার্টির ক্ষেত্রে দলের বিভিন্ন কমিটির কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার বিধান রয়েছে। কমিউনিষ্ট পার্টির গঠনতন্ত্রে গোপন ব্যালটের কথা বলা আছে। কিন্তু 'কেতাবে আছে গোয়ালে নেই' – এ প্রবাদের মতো আওয়ামী লীগের নির্বাচনের বিধান থাকলেও বস্তুত তা হয় না। এছাড়াও গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, আওয়ামী লীগের সভাপতির বিশেষ কোন ক্ষমতা নেই। তবে বাস্তবে নেতৃত্ব নির্বাচন থেকে শুরু করে দলের সবকিছুই সভাপতির অভিপ্রায় অনুযায়ী হয়ে থাকে। এছাড়া সময়মত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন হয় না। পক্ষান্তরে বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের দলীয় প্রধানই সর্বেসর্বা। দলীয় প্রধানই সব কমিটিকে মনোনয়ন ও অপসারণ করেন। এমন কি গণতন্ত্রের বিধান বিএনপি ও জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্রে নেই।

আর্থিক স্বচ্ছতা প্রধান তিনটি দলে মোটেও নেই। বরং এদের বিরুদ্ধে 'মনোনয়ন বাণিজ্য'সহ বহু অর্থনৈতিক অসদাচারণের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো' যে প্রতিবছর কোটি কোটি ব্যয় করে, তা কোথা থেকে আসে তা কেউ জানে না। পক্ষান্তরে, জামায়াতের আয়ের বহু ব্যবসায়িক উৎস রয়েছে বলে শোনা যায়। আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির লেজুড়বৃত্তির অঙ্গ সংগঠন সৃষ্টির বিধান দলের গঠনতন্ত্রে রয়েছে। লক্ষ্যনীয় যে, জামায়াত ও কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনতন্ত্রে অঙ্গ সংগঠনের কোন বিধান নেই,যদিও এ দু'টি দলের অত্যন্ত নিবেদিত অঙ্গ সংগঠন রয়েছে।

পরিশেষে, আমাদের আজকের গণতন্ত্রের সংকট মূলত রাজনৈতিক দলের সংকট। আমাদের দেশে যথাযথ অর্থাৎ গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ রাজনৈতিক দর আজও গড়ে ওঠে নি, যা কার্যকর গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। তাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাজনৈতিক দলের সংস্কারের আজ কোন বিকল্প নেই। সংস্কারের মাধ্যমেই রাজনৈতিক দলগুলোকে সন্ত্রাসী, কালো টাকার মালিক তথা দুর্বৃত্তমুক্ত করতে হবে। রাজনৈতিক দলে গণতন্ত্র, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দলকে পরিবারতন্ত্র থেকে মুক্ত করতে হবে। দলকে জনকল্যাণমূখী করতে হবে। আশা করি যে, আমাদের জাতীয় নেতৃত্ববৃন্দ এ কাজে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসবেন। তা না হলে জাতি হিসেবে আমাদেরকে ভবিষ্যতে আরো বহু দুর্ভোগ পোহাতে হবে। আর রাজনীতিবিদরা এগিয়ে আসবেন যদি জনগণ তাদের স্ব স্ব অবস্থান থেকে সংস্কারের দাবিতে সোচ্চার হয়।

কারণ রাজনৈতিক দল তথা রাজনীতিবিদদের প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি, দেশপ্রেম ও সততার ওপরই নির্ভর করে দেশের গণতন্ত্র সুশাসন ও উন্নয়ন। রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে আসুক সেই রাজনীতিবিদরা, যারা রাজনীতিকে শোসিত, বঞ্চিত মানুষের কল্যাণের জন্য ব্রত হিসাবে নিয়েছেন, বাণিজ্য হিসাবে নয়। এ লক্ষ্যে চলমান রাজনৈতিক ধারা ও দলে আমূল সংস্কার প্রয়োজন। প্রয়োজন দলে গণতান্ত্রিক চর্চা, সৎ ও ত্যাগী নেতাদের যথার্থ মূল্যায়নের পরিবেশ সৃষ্টি। এ সংস্কার রাজনৈতিক দলসমূহের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এতে করে যে সংস্কার আসবে তার ফলাফল অনেক বেশি কার্যকর ও টেকসই হবে। যদি রাজনৈতিক দলগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংস্কারে উদ্যোগী না হয়, তাহলে আইন করেই সংস্কার করতে হবে, যাতে করে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে দেশপ্রেমিক, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিগণ দেশ পরিচালনায় নেতৃত্ব দিতে পারেন। তবে শুধু সংস্কার করলেই হবে না, সংস্কারের সুফল পাওয়ার লক্ষ্যে জনগণকে সংগঠিত, সচেতন ও সোচ্চার করে তুলতে হবে। আর এ দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের সকলকে।

দেখা যায় প্রধান প্রধান দলের গঠনতন্ত্রে গণতন্ত্র চর্চার কোন সুযোগই নেই। গঠনতন্ত্র বিএনপি ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানকে গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়েই এককভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা দিয়েছে। যেমন, এ দু'টি দলের চেয়ারম্যান ইচ্ছা করলে যে কোন কমিটি বাতিল, বিলোপ, যেকোন ব্যক্তিকে নিয়োগ, অপসারণ এবং সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এ দু'টো দলের গঠনতন্ত্র কি দেশে সুশাসন ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্য সহায়ক? তুলনামূলকভাবে আওয়ামীলীগের গঠনতন্ত্র অনেকটা গণতান্ত্রিক। আওয়ামীলীগের গঠনতন্ত্রে সভাপতির বিএনপি ও জাতীয় পার্টির মতো এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা না থাকলেও বাস্তবে সভাপতির ইচ্ছা অনিচ্ছাতেই দলীয় সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে পরিমান অর্থ ব্যয় করে থাকেন তার উৎস সম্পর্কে জনমনে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। গত ২২ জানুয়ারির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মনোনয়ন বানিজ্যের যে চিত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তা ভয়াবহ। দলের আর্থিক স্বচ্ছতা যদি নিশ্চিত করা না যায় এবং অর্থের জোরে দুর্নীতিপরায়ন ব্যক্তিরা যদি দলের মনোনয়ন পেয়ে সংসদ প্রতিনিধি হয়ে আসে তাহলে আমরা বার বার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হতেই থাকব। এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া জরুরি। তা না হলে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত আমোদের এ দেশ একটি অকার্যকর ও অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে। যা আমাদের কারো কাম্য নয়।

গণতন্ত্রের জন্য তাই দলের সকল স্তরে কাউন্সিলারদের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কর্মকর্তা নির্বাচনের বিধান রাখা আবশ্যক। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিশেষ করে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ইত্যাদি পদে একজন মাত্র প্রার্থী থাকলে তাদের প্রতি কতজন কাউন্সিলারের সমর্থন আছে তা যাচাইয়ের জন্য গোপন ভোটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাদের মধ্যে ৫০ % কাউন্সিলারের সমর্থন না থাকলে ঐ প্রার্থী উপরিউক্ত পদে নির্বাচিত বলে গণ্য হবেন না।

বিএনপি'র জন্যও উপরিউক্ত আওয়ামীলীগের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বিধানসমূহ গণ্য হতে পারে। এছাড়াও কোন ব্যক্তি নিম্নস্তরের কোন কমিটির কোন পদে নূন্যতম সময় পর্যন্ত দায়িত্ব পালন না করলে কেন্দ্রীয় কমিটির কোন পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না এরূপ বিধান গঠনতন্ত্রে সংযোজন করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে ত্যাগী নেতাদের যেমন মূল্যায়ন হবে তেমনিভাবে পরিবারতন্ত্রের ধারা বিলুপ্ত হবে।

নব্বই এর গণ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরশাসকের পতনের পর আমরা সবাই আশা করেছিলাম দেশে একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবে। শাসন ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হবে সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ"। বাস্তবে ঘটেছে সম্পূর্ণ উল্টো। জনগণ তাদের মালিকানা হারিয়ে ফেলেছে একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের নিকট। সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর একনায়কতন্ত্র। জনসেবা নয়, বরং যে কোন উপায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়াই প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর একমাত্র লক্ষ্য। যার ফলশ্রুতিতে গত ২২ জানুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশে সৃষ্টি হয় এক ভয়াবহ অরাজক পরিস্থিতি। সেনাবাহিনীর সহায়তায় বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের ফলে জাতি চরম অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং জনমনে ফিরে এসেছে স্বস্তি। আগামী নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ ও অর্থবহ করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বেশ কিছু সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো রাজনৈতিক দলের সংস্কার তথা দলের আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিতকরণ।